ফাল্গুনী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ

১৯২২

মূল্য ১৶০ আঠার আনা

যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর
তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের

এবং সেই সঙ্গে

সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী

আমার সকল গানের ভাণ্ডারী

শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথের হস্তে

এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো

সমর্পণ করিলাম।

১৫ই ফাল্গুন

১৩২২।

ফাল্গুনীর পাত্রগণ

রাজা

মন্ত্রী

শ্রুতিভূষণ

কবিশেখর

নববসন্তের দূতগণ

শীত

নবযৌবনের দল

চন্দ্রহাস ... ... উক্ত দলের প্রিয়সখা

দাদা ... ... উক্ত দলের প্রবীণ যুবক

জীবন সর্দ্দার ... ... উক্ত দলের নেতা

অন্ধ বাউল

মাঝি

কোটাল

অনাথ কলু—ইত্যাদি।

এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্ত্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দ্দার ছাড়া আর কাহারো নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা-খুসি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।

সূচনা
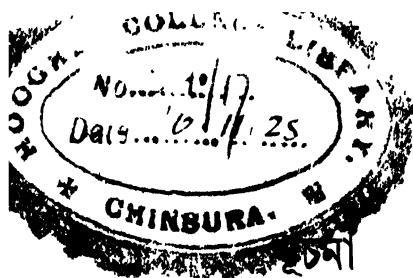
দৃশ্য—রাজোদ্যান

চুপ, চুপ, চুপ কর্ তোরা।

কেন, কি হয়েচে ?

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ !

কেরে ? কে বাজায় বাঁশি ?

কেন ভাই, কি হয়েচে ?

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ !

ছেলেগুলো দাপাদাপি করচে কা'র ?

আমাদের মণ্ডলদের।

মণ্ডলকে সাবধান করে' দে! ছেলেগুলোকে ঠেকাক্ !

মন্ত্রী কোথায় গেলেন ?

এই যে এখানেই আছি।

খবর পেয়েছেন কি ?

কি বল দেখি !

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

কিন্তু প্রত্যন্তবিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেচে যে !

যুদ্ধ চলুক কিন্তু তা'র সংবাদটা এখন চল্‌বে না।

চীন-সম্রাটের দূত অপেক্ষা করচেন।

অপেক্ষা করতে দোষ নেই কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।

ঐযে মহারাজ আস্‌চেন।

জয় হোক্ মহারাজের।

মহারাজ, সভায় যাবার সময় হ'ল।

যাবার সময় হ'ল বৈ কি, কিন্তু সভায় যাবার নয় !

সে কি কথা, মহারাজ ?

সভা ভাঙবার ঘণ্টা বেজেচে শুন্‌তে পেয়েচি।

কই, আমরা ত কেউ—

তোমরা শুন্‌বে কি করে'? ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েচে।

এত বড় স্পর্দ্ধা কা'র হ'তে পারে ?

মন্ত্রী, এখনো বাজাচ্চে।

মহারাজ, দাসের স্থূলবুদ্ধি মাপ করবেন, বুঝতে পারলুম না।

এই চেয়ে দেখ—

মহারাজের চুল—

ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখতে পাচ্চ না ?

দাসের সঙ্গে পরিহাস ?

পরিহাস আমার নয়, মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীসুদ্ধ জীবের কানে ধরে' পরিহাস করেন এ তাঁরই। গত রজনীতে আমার গলায় মল্লিকার মালা পরাবার সময় মহিষী চম্‌কে উঠে বল্লেন, এ কি মহারাজ, আপনার কানের কাছে ছুটো পাকাচুল দেখচি যে!

মহারাজ, এজন্য খেদ করবেন না—রাজবৈদ্য আছেন তিনি—

এ বংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কি করতে পেরেছিলেন ?—মন্ত্রী, যমরাজ আমার কাণের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েচেন। মহিষী এ ছুটো চুল তুলে ফেল্‌তে চেয়েছিলেন, আমি বল্লুম, কি হবে রাণী ? যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলিখককে ত সরানো যায় না। অতএব এ পত্র শিরোধার্য্য করাই গেল!—এখন তা'হলে—

যে আজ্ঞা, এখন তাহ'লে রাজকার্য্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য্য! রাজকার্য্যের সময় নেই—
শ্রুতিভূষণকে ডেকে আন।

সেনাপতি বিজয়বর্ম্মা—

না, বিজয়বর্ম্মা না, শ্রুতিভূষণ।

মহারাজ, এদিকে চীন-সম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড় সম্রাটের দূত অপেক্ষা করচেন।
ডাক শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ, প্রত্যন্তসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী, প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেচে, ডাক
শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজের শ্বশুর—

আমি যাঁর কথা বল্‌চি তিনি আমার শ্বশুর নন্।
ডাক শ্রুতিভূষণকে।

আমাদের কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায়
আনন্দে সঞ্চরণ করুন, ডাক শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাক্‌তে পাঠাচ্চি।

বোলো, সঙ্গে যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথিটা
আনেন।

প্রতিহারী, বাইরে ঐ কা'রা গোল করচে, বারণ কর, আমি একটু শান্তি চাই।

নাগপত্তনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

আমার ত সময় নেই মন্ত্রী, আমি শান্তি চাই।

তা'রা বল্‌চে তাদের সময় আরো অনেক অল্প— তা'রা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেচে—তা'রা ক্ষুধাশান্তি চায়।

ক্ষুধাশান্তি! এ সংসারে কি ক্ষুধার শান্তি আছে? ক্ষুধানলের শান্তি চিতানলে।

তাহ'লে মহারাজ, ঐ হতভাগ্যদের—

ঐ হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছটফট করা বৃথা, আজই হোক্ কালই হোক্ সে টেনে তুল্‌বেই।

অতএব—

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্য-বারিধি পুঁথি।

প্রজারা তাহ'লে দুর্ভিক্ষ—

দেখ মন্ত্রী, ভিক্ষা ত অন্নের নয়, ভিক্ষা আয়ুর। সেই

ভিক্ষায় জগৎ জুড়ে দুর্ভিক্ষ—কি রাজার কি প্রজার—কে কা'কে রক্ষা করবে ?

অতএব—

অতএব শ্মশানেশ্বর শিব যেখানে ডমরুধ্বনি করচেন সেইখানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাইচাপা পড়বে —তবে কেন মিছে গলা ভাঙা ! এই যে শ্রুতি-ভূষণ, প্রণাম !

শুভমস্তু !

শ্রুতিভূষণ মশায়, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন যে অবসাদ-গ্রস্ত নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতিভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কি বল্‌চেন ?

উনি বল্‌চেন লক্ষ্মীর স্বভাব সম্বন্ধে মহারাজকে কিছু উপদেশ দিতে।

আপনার উপদেশ কি ?

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ কর, শুন মূঢ় শুন !

অহো, আপনার উপদেশের এক ফুৎকারেই আশা-
প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্ব্বাপিত হ'য়ে যায়।
আমাদের আচার্য্য বলেচেন না—

অঙ্গং দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং!

মহারাজ, আশার কথা যদি তুল্লেন তবে বারিধি
থেকে আর একটি চৌপদী শোনাই—

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হ'য়ে থাকে।

হায় হায় অমূল্য আপনার বাণী! শ্রুতিভূষণকে
এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এখনি—ও কি মন্ত্রী, আবার
কা'রা গোল করচে?

সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনি শান্ত হ'তে বল।

তাহ'লে, মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে
পাঠিয়ে দিন না—আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের
পরামর্শটা—

না, না, যুদ্ধ পরে হবে, শ্রুতিভূষণকে ছাড়তে পারচিনে।

মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার কথা বলছিলেন কিন্তু সে দান যে ক্ষয় হ'য়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখচেন—

স্বর্ণদান করে যেই করে দুঃখ দান
যত স্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ।
শত দাও, লক্ষ দাও, হ'য়ে যায় শেষ,
শূন্য ভাণ্ড ভরি শুধু থাকে মনঃক্লেশ।

আহা শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল। প্রভু কি তাহ'লে—

না আমি সহস্রমুদ্রা চাইনে!

দিন্ দিন্ একটু পদধূলি দিন্! সহস্র মুদ্রা চান্ না। এত বড় কথা!

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হ'য়ে যাতে মহারাজের পুণ্যফলকে অসীম করে আমি এমন কিছু চাই! গোধনসমেত আপনার ঐ কাঞ্চনপুর জনপদটি যদি ব্রহ্মত্রদান করেন কেবলমাত্র ঐটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব; কারণ বৈরাগ্য-বারিধি বলচেন—

বুঝেছি শ্রুতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির

প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাঞ্চনপুর জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন—আবার কি, বারবার কেন চীৎকার করচে?

চীৎকারটা বারবার করচে বটে কিন্তু কারণটা একই র'য়ে গেছে! ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিক্ষ-কাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বল্‌তে বলেচেন তিনি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝঙ্কার ধ্বনিত করতে চান কিন্তু আভরণের অভাব-বশত শব্দ বড়ই ক্ষীণ হ'য়ে বাজ্‌চে।

মন্ত্রী!

মহারাজ!

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন করতে যেন বিলম্ব না হয়।

আর মন্ত্রীমশায়কে বলে' দিন, আমরা সর্ব্বদাই পরমার্থচিন্তায় রত, বৎসরে বৎসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হ'লে চিত্তবিক্ষেপ হয় অতএব রাজ-শিল্পী যদি আমার গৃহটি সুদৃঢ় করে' নির্ম্মাণ করে' দেয় তাহ'লে তা'র তলদেশে শান্তমনে বৈরাগ্য সাধন করতে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ করে' দাও।

মহারাজ, এবৎসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে ত প্রতিবৎসরেই শুনে আসচি। মন্ত্রী, তোমাদের উপর ভার ধন বৃদ্ধি করবার, আর আমার উপর ভার অভাব বৃদ্ধি করবার! এই দুইয়ের মিলে সন্ধি করে' হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারিনে। উনি দেখচেন আপনার অর্থ, আর আমরা দেখচি আপনার পরমার্থ সুতরাং উনি যেখানে দেখতে পাচ্চেন অভাব, আমরা সেইখানে দেখতে পাচ্চি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে লিখচেন—

রাজকোষ পূর্ণ হ'য়ে তবু শূন্যমাত্র,
যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা,
পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হা! আপনাদের সঙ্গ অমূল্য।

কিন্তু মহারাজের সঙ্গ কত মূল্যবান, শ্রুতিভূষণমশায় তা বেশ জানেন। তাহ'লে আসুন শ্রুতিভূষণ, বৈরাগ্যসাধনের ফর্দ্দ যা দিলেন সেটা সংগ্রহ করা যাক্!

চলুন তবে চলুন, বিলম্বে কাজ নেই। মন্ত্রী এই সামান্য বিষয় নিয়ে যখন এত অধীর হয়েছেন তখন ওঁকে শান্ত করে' এখনি আবার ফিরে আসচি!

আমার সর্ব্বদা ভয় হয় পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে অরণ্যে চলে' যান!

মহারাজ, মনটা মুক্ত থাকলে কিছুই ত্যাগ করতে হয় না—এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই আমার অরণ্য! এক্ষণে তবে আসি! মন্ত্রী, চল চল।

ঐ যে কবিশেখর আস্‌চে—আমার তপস্যা ভাঙলে বুঝি! ওকে ভয় করি! ওরে পাকাচুল, কান ঢেকে থাক্‌রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়!

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান?

কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে এখন কবিকে রেখে হবে কি!

সংবাদটা কোথায় পৌঁছল?

ঠিক আমার কানের উপর! চেয়ে দেখ!

পাকাচুল ? ওটাকে আপনি ভাবচেন কি ?
যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে শাদা করার চেষ্টা !
কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ঐ শাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগবে।
কই রঙের আভাস ত দেখিনে !
সেটা গোপনে আছে। শাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।
চুপ, চুপ, চুপ কর, কবি, চুপ কর !
মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হ'ল ত হোক না! আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসচেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েচেন —নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চল্‌চে।
আরে, আরে, তুমি দেখচি বিপদ বাধাবে, কবি ! যাও যাও তুমি যাও—ওরে শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে ডেকে নয়ে আয় !
তাঁকে কেন, মহারাজ ?
বৈরাগ্যসাধন করব।
সেই খবর শুনেই ত ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমই ত আপনার সহচর !
তুমি ?

হাঁ মহারাজ, আমরাই ত পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম তবু বুঝতে পারলে না ? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য ! সেইজন্যেই ত লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই !

তোমাদের মন্ত্রটা কি ?

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁক্‌ড়ে বসে' থাকিস্‌নে— বেরিয়ে পড়্‌ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল !

সংসারে পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হ'ল ?

তা নয় ত কি মহারাজ ? সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা ; তা'রই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই ত বৈরাগী, সেই ত পথিক, সেই ত কবিবাউলের চেলা !

তাহ'লে শান্তি পাব কি করে' ?

শান্তির উপরে ত আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি ত পাওয়া চাই !

ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।

সে কি কথা?—বিপদ বাধাবে দেখচি! ওরে শ্রুতিভূষণকে ডাক্ !

আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলি ছাড়তে ছাড়তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানিনে।

এ তোমার কি রকম কথা ?

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে নদী বেরিয়ে পড়েচে তা'র বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ ? সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে-দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্চে বালির মরুভূমি—তা'র মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল। তা'র দেওয়া যেম্‌নি ঘোচে অম্‌নি তা'র পাওয়াও ঘোচে।

ঐ শোন কবিশেখর, কান্না শোন। ঐ ত তোমার সংসার !

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

আমার প্রজা? বল কি কবি? সংসারের প্রজা ওরা! এ দুঃখ কি আমি সৃষ্টি করেচি? তোমার কবিত্বমন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কি প্রতিকার করতে পারে বল ত!

মহারাজ, এ দুঃখকে ত আমরাই বহন করিতে পারি! আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে ব'য়ে চলেচি। নদী কেমন করে' ভার বহন করে দেখেচেন ত? মাটির পাকা রাস্তাই হ'ল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই ত ভারকে কেবলি সে ভারী করে' তোলে; বোঝা তা'র উপর দিয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে চলে, আর তা'রও বুক ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যায়। নদী আনন্দে ব'য়ে চলে, তাই ত সে আপনার ভার লাঘব করেছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েচি সকলের সব সুখ দুঃখকে চলার লীলায় ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দ্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেচেন—তাই ত বসে' থাক্‌তে পারিনে,—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে'
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

যাক্‌গে শ্রুতিভূষণ! ওহে কবিশেখর, আমার কি মুস্কিল হয়েচে জান? তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারিনে অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তা'র উল্টো; তা'র কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে,—ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে—কিন্তু সুরটা—সে কি আর বলব!

মহারাজ, আমাদের কথা ত বোঝবার জন্যে হয় নি, বাজ্‌বার জন্যে হয়েচে!

এখন তোমার কাজটা কি বল ত কবি?

মহারাজ, ঐ যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেচে ঐ কান্নার মাঝখানদিয়ে এখন ছুট্‌তে হবে।

ওহে, কবি, বল কি তুমি! এ সমস্ত কেজো লোকের কাজ, দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কি করবে?

কেজো লোকেরা কাজ বেসুরো করে' ফেলে, তাই, সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আস্‌তে হয়!

ওহে কবি, আর একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও!

মহারাজ, ওরা কর্ত্তব্যকে ভালবাসে বলে' কাজ করে আমরা প্রাণকে ভালবাসি বলে' কাজ করি —এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্ম্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জ্জীব!

কিন্তু জিৎটা হ'ল কা'র?

আমাদের, মহারাজ, আমাদের!

তা'র প্রমাণ?

পৃথিবীতে যা কিছু সকলের বড় তা'র প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে মুছে ফেলতে পার তাহ'লেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তা'দের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলক্ষেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেচে কা'রা! মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ যে কান্না উঠেচে সে কান্না থামায় কা'রা? যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেচে তা'রা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে' রয়েচে তা'রা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তা'রাও নয়, যারা কর্ত্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপ্‌চে তা'রাও

নয়, যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তা'রা, ত্যাগ করেও তা'রাই, বাঁচতে জানে তা'রা, মরতেও জানে তা'রা, তা'রা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তা'রা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে,—সৃষ্টি করে তা'রাই, কেন না তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র!

ওহে কবি, তা'হলে তুমি আমাকে কি করতে বল?

উঠ্‌তে বলি, মহারাজ, চল্‌তে বলি! ঐ যে কান্না, ওযে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান! কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা—কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে তবে অকর্ত্তব্য হ'ল বলে' ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেচি বলে'!

কিন্তু মরবই যে, কবিশেখর, আজ হোক্ আর কাল হোক্!

কে বল্লে মহারাজ, মিথ্যা কথা! যখন দেখচি বেঁচে আছি, তখন জানচি যে বাঁচবই;—যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই করে'

দেখলে না সেই বলে মরব—সেই বলে "নলিনী-
দলগত জলমতি তরলং তদ্বৎজীবনমতিশয়
চপলং।"

কি বল হে, কবি, জীবন চপল নয়?

চপল বই কি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা
চিরদিন চপলতা করতে-করতেই চল্‌বে। মহারাজ,
আজ তুমি তা'র চপলতা বন্ধ করে' মরবার পালা
অভিনয় আরম্ভ করতে বসেছ?

ঠিক বল্‌চ কবি? আমরা বাঁচবই?

বাঁচবই!

যদি বাঁচবই তবে বাঁচার মত করেই বাঁচতে হবে—
কি বল!

হাঁ মহারাজ!

প্রতিহারী!

কি মহারাজ!

ডাক, ডাক, মন্ত্রীকে এখনি ডাক।

কি মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেচ কেন?

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে?

বিজয়বর্ম্মাকে বিদায় করে' দিতে।

কি মুস্কিল! বিদায় করবে কেন? যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে!

চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের?

মহারাজের ত দর্শন হবে না তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী, আশ্চর্য্য করলে দেখচি—রাজকার্য্য কি এমনি করেই চল্‌বে? হঠাৎ তোমার হ'ল কি?

তা'র পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙবার জন্যে লোকের সন্ধান করছিলুম—আর ত কেও রাজী হয় না, কেবল দিঙ্‌নাগের বংশে যাঁরা অলঙ্কারের আর ব্যাকরণ শাস্ত্রের টোল খুলেচেন তাঁরা দলে-দলে সাবল হাতে ছুটে আস্‌চেন।

সর্ব্বনাশ! মন্ত্রী, পাগল হ'লে না কি? কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবে?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙতে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির করেচেন কবিশেখরের ঐ বাসাটা আজ থেকে তিনিই দখল করবেন!

কি বিপদ ! সরস্বতী যে তা হ'লে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন ! না, না, সে হবে না !

আর একটা কাজ ছিল—শ্রুতিভূষণকে কাঞ্চনপুরের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ও হো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হয়েছে বুঝি ? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কি কথা মহারাজ ! আমার পুরস্কার ত জনপদ নয়—আমরা জন-পদের সেবা ত কখনো করিনি—তাই ঐ পদপ্রাপ্তিটা আশাও করিনে।

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যেই থাক্ !

আর, মহারাজ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বিদায় করবার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান করেচি।

মন্ত্রী, আজ দেখচি পদে পদে তোমার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটচে। দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ !

কি প্রতিহারী !

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেচেন !

সর্ব্বনাশ করলে ! ফেরাও তা'কে ফেরাও ! মন্ত্রী,

দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ না এসে পড়ে!"
আমার দুর্ব্বল মন, হয়ত সামলাতে পারব না,
হয়ত অন্যমনস্ক হ'য়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে
গিয়ে পড়ব। ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছু মাত্র
সময় দিয়ো না—প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখ—
একটা যা-হয়-কিছু কর—যেমন এই ফাল্গুনের
হাওয়াটা যা-খুসি-তাই করচে তেমনিতর! হাতে
কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিম্বা
প্রকরণ, কিম্বা রূপক, কিম্বা ভাণ, কিম্বা—

তৈরি আছে—কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি
রূপক, কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না!

যা রচনা করেচ তা'র অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে
পারব?

না মহারাজ! রচনা ত অর্থ গ্রহণ করবার জন্যে নয়।

তবে?

সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি ত
বলেচি আমার এ সব জিনিস বাঁশির মত,
বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।

বল কি হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই?

কিচ্ছু না!

তবে তোমার ও রচনাটা বল্‌চে কি ?

ও বল্‌চে, আমি আছি ! শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ ? শিশু হঠাৎ শুন্‌তে পায় জলস্থল আকাশ তা'কে চারদিক থেকে বলে' উঠেচে—"আমি আছি !" —তা'রই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়াপেয়ে বলে' ওঠে—"আমি আছি !" আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া !

তা'র বেশি আর কিচ্ছু না ?

কিচ্ছু না ! আমার রচনার মধ্যে প্রাণ বলে' উঠেচে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে-পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয় এই আমি-আছির জয়, জয় এই আনন্দময় আমি-আছির জয় !

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাক্‌লে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস চল্‌বে না।

সে কথা সত্য মহারাজ! আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জ্জন করতে চায় উপলব্ধি করতে চায় না ! ওরা বুদ্ধিমান !

তা হ'লে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়? আমার রাজবিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের ডাকব কি?

না মহারাজ, তা'রা কাব্য শুনেও তর্ক করে! নতুন শিং ওঠা হরিণশিশুর মত ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়!

তবে?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেচে।

সে কি কথা কবি?

হাঁ মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তা'রা ভোগবতী পার হ'য়ে আনন্দ-লোকের ডাঙা দেখ্‌তে পেয়েচে। তা'রা আর ফল চায় না, ফল্‌তে চায়!

ওহে কবি, তবে ত এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য শোন্‌বার বয়েস হয়েচে। বিজয়বর্ম্মাকেও ডাকা যাক্!

ডাকুন্।

চীন-সম্রাটের দূতকে?

ডাকুন!

আমার শ্বশুর এসেছেন শুন্‌চি—

তাঁকে ডাক্‌তে পারেন—কিন্তু শ্বশুরের ছেলেগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তাই বলে' শ্বশুরের মেয়ের কথাটা ভুলো না কবি।

আমি ভুল্‌লেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশঙ্কা নেই।

আর শ্রুতিভূষণকে?

না মহারাজ, তাঁর প্রতি ত আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাব?

কবি তাহ'লে প্রস্তুত হওগে!

না মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হ'য়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।

চিত্রপট—

চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপট—সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।

এ নাটকে গান আছে না কি?

হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।

গানের বিষয়টা কি?

শীতের বস্ত্রহরণ।

এ ত কোনো পুরাণে পড়া যায় নি।

বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে! ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তা'র বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতন-টাই নূতন।

এ ত গেল গানের কথা, বাকিটা?

বাকিটা প্রাণের কথা।

সে কি-রকম?

যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তা'কে ধরবে বলে' পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তখন—

তখন কি দেখ্‌লে?

কি দেখ্‌লে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

কিন্তু একটা কথা বুঝ্‌তে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা না কি?

না মহারাজ—বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চল্‌চে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই ত ভাব চুরি করেচি।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে ?

এক হচ্চে সর্দ্দার।

সে কে ?

। যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্চে। আর একজন হচ্চে চন্দ্রহাস।

সে কে ?

যাকে আমরা ভালবাসি—আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় করেচে।

আর কে আছে ?

দাদা—প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেচে।

আর কেউ আছে ?

আর আছে এক অন্ধ বাউল।

অন্ধ ?

হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখে না বলেই সে তা'র দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্রদের মধ্যে আর কে আছে ? আপনি আছেন।

আমি ?

হাঁ মহারাজ, আপনি যদি এর ভিতরে না থেকে

বাহিরেই থাকেন তাহ'লে কবিকে গাল্প দিয়ে বিদায় করে' ফের শ্রুতিভূষণকে নিয়ে বৈরাগ্য-বারিধির চৌপদী ব্যাখ্যায় মন দেবেন। তাহ'লে মহারাজের আর মুক্তির আশা নাই। স্বয়ং বিশ্বকবি হার মান্‌বেন—ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া দক্ষিণা না পেয়েই বিদায় হবে।
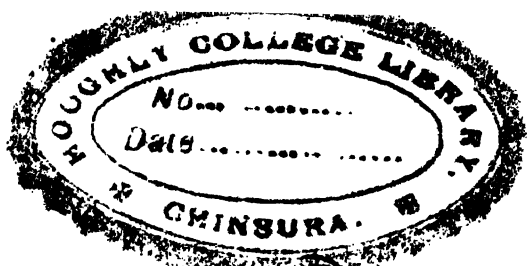
ফাল্গুনী

প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

—~~~—

নবীনের আবির্ভাব

বেণুবনের গান

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে !
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে ।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে ।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা ।

জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে।

পাখীর নীড়ের গান

আকাশ আমায় ভর্‌ল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হান্‌ব হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জ্বলাস্‌,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হ'ল রঙীন তানে।

দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস্!
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে।

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।

আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল পারা,
পথে পথে বাহির হ'য়ে
আপন-হারা!
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তা'র,
বোঝে নিশার নীরব তারা!

প্রথম দৃশ্য

পথ

সূত্রপাত

যুবকদলের প্রবেশ

গান

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্ম্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তা'র মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে॥

ফাগুনের গুণ আছেরে, ভাই, গুণ আছে!

বুঝলি কি করে'?

নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে কিসের জোরে?

তাই ত—দাদা আমাদের চৌপদীছন্দের বোঝাই নৌকো—ফাগুনের গুণে বাধা পড়ে' কাগজ কলমের উল্টো মুখে উজিয়ে চলেছে।

চন্দ্রহাস। ওরে ফাগুনের গুণ নয়রে! আমি চন্দ্রহাস, দাদার তুলট কাগজের হল্‌দে পাতাগুলো পিয়াল বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি; দাদা খুঁজতে বের হয়েছে।

তুলট কাগজগুলো গেছে আপদ গেছে কিন্তু দাদার শাদা চাদরটা ত কেড়ে নিতে হচ্চে।

চন্দ্রহাস। তাই ত, আজ পৃথিবীর ধুলোমাটি পর্য্যন্ত

শিউরে উঠেছে আর এ পর্য্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তর আমেজ লাগল না!

দাদা। আহা কি মুস্কিল! বয়েস হয়েছে যে!

পৃথিবীর বয়েস অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হ'তে ওর লজ্জা নেই।

চন্দ্রহাস। দাদা, তুমি বসে' বসে' চৌপদী লিখচ, আর এই চেয়ে দেখ সমস্ত জলস্থল কেবল নবীন হবার তপস্যা করচে।

দাদা, তুমি কোটরে বসে' কবিতা লেখ কি করে'?

দাদা। আমার কবিতা ত তোদের কবিশেখরের কল্প-মঞ্জরীর মত সৌখীন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছেরে, ভার আছে।

যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।

দাদা। শোন্ তবে বলি,—

ঐরে দাদা এবার চৌপদী বের করবে!

এলরে এল চৌপদী এল! আর ঠেকানো গেল না।

ভো ভো পথিকবৃন্দ, সাবধান, দাদার মত্ত চৌপদী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

চন্দ্রহাস। না দাদা, তুমি ওদের কথায় কান দিয়ো

না। শোনাও তোমার চৌপদী! কেউ না টি'কতে পারে আমি শেষ পর্য্যন্ত টি'কে থাক্‌ব। আমি ওদের মত কাপুরুষ নই।

আচ্ছা বেশ, আমরাও শুন্‌ব।

যেমন করে' পারি শুন্‌বই।

খাড়া দাঁড়িয়ে শুন্‌ব। পালাব না।

চৌপদীর চোট যদি লাগে ত বুকে লাগবে, পিঠে লাগবে না।

কিন্তু দোহাই দাদা, একটা! তা'র বেশি নয়।

দাদা। আচ্ছা, তবে তোরা শোন্!

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে
যে হেতু সে লাগে বিশ্বকাজে।

আর একটু ধৈর্য্য ধর ভাই, এর মানেটা—

আবার মানে!

একে চৌপদী—তা'র উপর আবার মানে!

দাদা। একটু বুঝিয়ে দিই—অর্থাৎ বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজ্‌ত তাহ'লে—

না, আমরা বুঝব না!

কোনোমতেই বুঝব না !

কা'র সাধ্য আমাদের বোঝায় !

আমরা কিচ্ছু বুঝব না বলেই আজ বেরিয়ে পড়েছি।

আজ কেউ যদি আমাদের জোর করে' বোঝাতে চায় তাহ'লে আমরা জোর করে' ভুল বুঝব।

দাদা। ও শ্লোকটার অর্থ হচ্চে এই যে, বিশ্বের হিত যদি না করি তবে—

তবে? বিশ্ব হাঁফ ছেড়ে বাঁচে !

দাদা। ঐ কথাটাকেই আর একটু স্পষ্ট করে' বলেছি—

অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে সশঙ্ক নিশীথে।
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কা'র হিতে?
শূন্যে কোন্ পুণ্য আছে আলোক বাঁটিতে?
মর্ত্ত্যে এলে কর্ম্মে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।

ওহে তবে আমাদের কথাটাকেও আর একটু স্পষ্ট করে' বলতে হ'ল দেখচি! ধর দাদাকে ধর— ওকে আড়কোলা করে' নিয়ে চল ওর কোটরে !

দাদা। তোরা অত ব্যস্ত হচ্চিস্ কেন বল্‌ত? বিশেষ কাজ আছে?

বিশেষ কাজ।

অত্যন্ত জরুরি।

দাদা। কাজটা কি শুনি?

বসন্তের ছুটিতে আমাদের খেলাটা কি হবে তাই খুঁজে বের করতে বেরিয়েছি।

দাদা। খেলা? দিন রাতই খেলা?

সকলের গান

মোদের যেমন খেলা তেম্নি যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই?
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

ঐ যে আমাদের সর্দ্দার আস্‌চে, ভাই!

আমাদের সর্দ্দার!

সর্দ্দার। কিরে ভারি গোল বাধিয়েছিস্‌ যে!

চন্দ্রহাস। তাই বুঝি থাক্‌তে পারলে না?

সর্দ্দার। বেরিয়ে আস্‌তে হ'ল।

ঐ জন্যেই গোল করি।

সর্দ্দার। ঘরে বুঝি টিঁকতে দিবি নে?

তুমি ঘরে টিঁকলে আমরা বাইরে টিঁকি কি করে'?

চন্দ্রহাস। এত বড় বাইরেটা পত্তন করতে ত চন্দ্রসূর্য্য-তারা কম খরচ হয় নি, এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তবে বিধাতার মুখরক্ষা হবে।

সর্দ্দার। তোদের কথাটা কি হচ্চে বল্ ত ?

কথাটা হচ্চে এই :—

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস্ নে কি ভাই ?

সর্দ্দার

গান

খেল্‌তে খেল্‌তে ফুটেছে ফুল,
খেল্‌তে খেল্‌তে ফল যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্বলে' যে হয় ছাই।

সকলে

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস্ নে কি ভাই ?

আমাদের এই খেলাটাতেই দাদার আপত্তি।

দাদা। কেন আপত্তি করি বল্‌ব ? শুন্‌বি ?

বল্‌তে পার দাদা, কিন্তু শুন্‌ব কি না তা বল্‌তে পারিনে।

দাদা।

সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভূরি ভূরি।
কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই ত খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

চন্দ্রহাস। বল কি তুমি দাদা ? সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে' যাওয়াই তা'র লক্ষ্য।

দাদা। তাহ'লে কাজটা ?

চন্দ্রহাস। চলার বেগে যে ধূলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।

দাদা। আচ্ছা সর্দ্দার, তুমি এর নিষ্পত্তি করে' দাও।

সর্দ্দার। আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করিনে। সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে চলি—ঐ আমার সর্দ্দারি।

দাদা। সব জিনিসের সীমা আছে কিন্তু তোদের যে কেবলি ছেলেমানুষি !

তা'র কারণ, আমরা যে কেবলি ছেলেমানুষ ! সব

জিনিসের সীমা আছে কেবল ছেলেমানুষির সীমা নেই।

(দাদাকে ঘেরিয়া নৃত্য)

দাদা। তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না?

না, হবে না বয়েস, হবে না।

বুড়ো হ'য়ে মরব তবু বয়েস হবে না।

বয়েস হ'লেই সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে' দেব।

মাথা মুড়োবার খরচ লাগ্‌বে না ভাই—তা'র মাথা ভরা টাক।

গান

আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,—মোদের
পাক্‌বে না চুল।
আমাদের ঝরবে না ফুল গো,—মোদের
ঝরবে না ফুল।
আমরা ঠেকব না ত কোনো শেষে,
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে!
আমাদের ঘুচবে না ভুল গো,—মোদের
ঘুচবে না ভুল।

সর্দ্দার

আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান
করব না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজব না জ্ঞান
খুঁজব না জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর পানে শিখর হ'তে রে,
আমাদের মিল্‌বে না কূল গো,—মোদের
মিল্‌বে না কূল!

এই উঠ্‌তি বয়সেই দাদার যে রকম মতি গতি, তা'তে কোন্ দিন উনি সেই বুড়োর কাছে মন্তর নিতে যাবেন—আর দেরি নাই!

সর্দ্দার। কোন্ বুড়ো রে?

চন্দ্রহাস। সেই যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না!

সর্দ্দার। তা'র খবর তোরা পেলি কোথা থেকে?

যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তা'র কথা বলে।

পুঁথিতে তা'র কথা লেখা আছে।

সর্দ্দার। তা'র চেহারাটা কি রকম ?

কেউ বলে, সে শাদা, মড়ার মাথার খুলির মত, কেউ বলে, সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মত।

কেন, তুমি কি তা'র খবর রাখ না সর্দ্দার ?

সর্দ্দার। আমি তা'কে বিশ্বাস করিনে।

বাঃ, তুমি উল্টো কথা বল্লে। সেই বুড়োই ত সব চেয়ে বেশি করে' আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তা'র বাসা।

পণ্ডিতজি বলে, বিশ্বাস যদি কাউকে না করতে হয় সে কেবল আমাদের। আমরা আছি কি নেই তা'র কোনো ঠিকানাই নেই।

চন্দ্রহাস। আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায় ?

সর্দ্দার। সর্ব্বনাশ করলে দেখচি ? তোরা পণ্ডিতের কাছে আনাগোনা সুরু করছিস্ নাকি ?

তা'তে ক্ষতি কি সর্দ্দার ?

সর্দ্দার। পুঁথির বুলির দেশে ঢুকলে যে একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে যাবি। কার্ত্তিকমাসের শাদা কুয়াশার মত। তোদের মনের মধ্যে একটুও

রক্তের রং থাকবে না। আচ্ছা এক কাজ কর্‌!
তোরা খেলার কথা ভাবছিলি ?

হাঁ সর্দ্দার, ভাবনায় আমাদের চোখে ঘুম ছিল না।
আমাদের ভাবনার চোটে পাড়ার লোক রাজ-
দরবারে নালিশ করতে ছুটেছিল।

সর্দ্দার। একটা নতুন খেলা বলতে পারি।

বল, বল, বল!

সর্দ্দার। তোরা সবাই মিলে বুড়োটাকে ধরে' নিয়ে আয়!

নতুন বটে, কিন্তু এটা ঠিক খেলা কি না জানি নে।

সর্দ্দার। আমি বলছি এ তোরা পারবিনে।

পারব না? বল কি! পারবই!

সর্দ্দার। কখনো পারবি নে।

আচ্ছা যদি পারি!

সর্দ্দার। তাহ'লে গুরু বলে' আমি তোদের মান্‌ব।

গুরু! সর্ব্বনাশ! আমাদের সুদ্ধ বুড়ো বানিয়ে
দেবে?

সর্দ্দার। তবে কি চাস্‌ বল্‌?

তোমার সর্দ্দারি আমরা কেড়ে নেব।

সর্দ্দার। তাহ'লে ত বাঁচিরে! তোদের সর্দ্দারি কি
সোজা কাজ? এমনি অস্থির করে' রেখেছিস্‌

যে হাড়গুলোসুদ্ধ উল্টোপাল্টা হ'য়ে গেছে।—
তাহ'লে রইল কথা ?

চন্দ্রহাস। হাঁ রইল কথা! দোলপূর্ণিমার দিনে তা'কে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে' দেব।

সর্দ্দার। বসন্ত উৎসব করব।

বল কি ? তাহ'লে যে আমের বোলগুলো ধরতে ধরতেই আঁটি হ'য়ে যাবে!

আর কোকিলগুলো প্যাঁচা হ'য়ে সব লক্ষ্মীর খোঁজে বেরবে।

চন্দ্রহাস। আর ভ্রমরগুলো অনুস্বার বিসর্গের চোটে বাতাসটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে মন্তর জপতে থাক্‌বে।

সর্দ্দার। আর তোদের খুলিটা সুবুদ্ধিতে এমনি বোঝাই হবে যে এক পা নড়তে পারবি নে।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার। আর ঐ ঝুমকো-লতায় যেমন গাঁঠে গাঁঠে ফুল ধরেছে তেমনি তোদের গাঁঠে গাঁঠে বাতে ধরবে।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার। আর তোরা সবাই নিজের দাদা হ'য়ে নিজের কান মল্‌তে থাক্‌বি।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার। আর—

আর কাজ কি সর্দ্দার! থাক্ বুড়োধরা খেলা! ওটা বরঞ্চ শীতের দিনেই হবে। এবার তোমাকে নিয়েই—

সর্দ্দার। তোদের দেখ্‌চি আগে থাক্‌তেই বুড়োর ছোঁয়াচ লেগেছে।

কেন? কি লক্ষণটা দেখ্‌লে?

সর্দ্দার। উৎসাহ নেই? গোড়াতেই পেছিয়ে গেলি? দেখই না কি হয়!

আচ্ছা, বেশ! রাজি!

চল্‌রে সব চল!

বুড়োর খোঁজে চল্!

যেখানে পাই তা'কে পাকা চুলটার মত পট্ করে' উপ্‌ড়ে আন্‌ব।

শুনেছি উপ্‌ড়ে আনার কাজে তা'রই হাত পাকা। নিড়ুনি তা'র প্রধান অস্ত্র।

ভয়ের কথা রাখ্। খেল্‌তেই যখন বেরলুম তখন ভয়, চৌপদী, পণ্ডিত, পুঁথি এ-সব ফেলে যেতে হবে।

গান

আমাদের ভয় কাহারে ?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কি আমাদের করতে পারে ?
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইক গলি,
নাইক ঝুলি, নাইক থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে না রে ।
আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে,—
আমাদের ভয় কাহারে ?

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের দ্বিধা

দুরন্ত প্রাণের গান

আমরা খুঁজি খেলার সাথী।
ভোর না হ'তে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারারাতি।
আমরা ডাকি পাখীর গলায়,
আমরা নাচি বকুল তলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি।

মরণকে ত মানিনে রে
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ করা ধন নিই যে কেড়ে।

আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়ব না গো তোমায় মোরা,
চলেছ কোন্ আঁধার পানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি।

২

শীতের বিদায় গান

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চল্‌ব সাগর পার গো!
বিদায় বেলায় এ কি হাসি,
ধরলি আগমনীর বাঁশি!
যাবার সুরে আসার সুরে
করলি একাকার গো!

সবাই আপন পানে
আমায় আবার কেন টানে?
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তা'রে এমন নূতন-করা?
মাঘ মরিল ফাগুন হ'য়ে
খেয়ে ফুলের মার গো!

৩

নব যৌবনের গান

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাব্‌চ বুঝি?
ও সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিন হাওয়ার পর।
তোমায় বাঁধ্‌ব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো।

৪

উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান

ছাড়্‌ গো আমায় ছাড়্‌ গো—
আমি চল্‌ব সাগর পার গো!

রঙের খেলায়, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে!
তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস্‌নে ভাই আর গো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

—:*:—

ঘাট

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো

কেন গো, তোমরা কা'কে চাও ?

আমরা বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

চন্দ্রহাস। কোন্ বুড়োকে ?

কোন্-বুড়োকে না। বুড়োকে।

তিনি কে ?

চন্দ্রহাস। আহা, আন্ধিকালের বুড়ো।

ওঃ বুঝেছি। তা'কে নিয়ে করবে কি ?

বসন্ত-উৎসব করব।

বুড়োকে নিয়ে বসন্ত-উৎসব ? পাগল হয়েছ ?

পাগল হঠাৎ হইনি। গোড়া থেকেই এই দশা :

আর অন্তিম পর্য্যন্তই এই ভাব।

গান

আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে ?
ছুট্‌ল বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ ক্ষ্যাপামির নেশায় পাওয়া ?
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্য্যতারাকে ॥

মাঝি। ওহে তোমাদের হাওয়ার জোর আছে—দরজায় ধাক্কা লাগিয়েছে।

এখন সেই বুড়োটার খবর দাও।

মাঝি। সেই যে বুড়িটা রাস্তার মোড়ে বসে' চরকা কাটে তা'কে জিজ্ঞাসা করলে হয় না!

জিজ্ঞাসা করেছিলুম—সে বলে, সাম্‌নে দিয়ে কত ছায়া যায়, কত ছায়া আসে, কা'কেই বা চিনি ?

ওযে একই জায়গায় বসে' থাকে ও কারো ঠিকানা জানে না।

মাঝি, তুমি ঘাটে ঘাটে অনেক ঘুরেচ, তুমি নিশ্চয় বল্‌তে পার কোথায় সেই—

মাঝি। ভাই, আমার ব্যবসা হচ্চে পথ ঠিক করা—কাদের পথ, কিসের পথ সে আমার জান্‌বার

দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্য্যন্ত,—
ঘর পর্য্যন্ত না।

আচ্ছা চল ত, পথগুলো পরখ করে' দেখা যাক্।

গান

কোন্ ক্ষ্যাপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর?
সেই তালে যে পা ফেলে' যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্‌রে সোজা, ফেলরে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে॥

মাঝি। ঐ যে কোটাল আস্‌চে, ওকে জিজ্ঞাসা করলে
হয়—আমি পথের খবর জানি, ও পথিকদের
খবর জানে।

ওহে কোটাল হে, কোটাল হে!

কোটাল। কে গো, তোমরা কে?

আমাদের যা দেখ্‌চ তাই, পরিচয় দেবার কিছুই
নেই।

কোটাল। কি চাই?

চন্দ্রহাস। বুড়োকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েচি।

কোটাল। কোন্ বুড়োকে?

সেই চিরকালের বুড়োকে।

কোটাল। এ তোমাদের কেমন খেয়াল? তোমরা খোঁজো তা'কে? সেই ত তোমাদের খোঁজ করচে?

চন্দ্রহাস। কেন বল ত?

কোটাল। সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে' নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের পরে তা'র বড় লোভ।

চন্দ্রহাস। আমরা তা'কে কষে গরম করে' দেব, সে ভাবনা নেই। এখন দেখা পেলে হয়। তুমি তা'কে দেখেচ?

কোটাল। আমার রাতের বেলার পাহারা—দেখি ঢের লোক, চেহারা বুঝিনে। কিন্তু বাপু, তা'কেই সকলে বলে ছেলে-ধরা, উল্টে তোমরা তা'কে ধরতে চাও—এটা যে পুরো পাগ্‌লামি।

দেখেচ? ধরা পড়েচি। পাগ্‌লামিই ত! চিন্‌তে দেরি হয় না।

কোটাল। আমি কোটাল, পথ-চল্‌তি যাদের দেখি সবাই এক ছাঁচের। তাই অদ্ভুত কিছু দেখলেই চোখে ঠেকে।

ঐ শোন ! পাড়ার ভদ্রলোকমাত্রই ঐ কথা বলে—
আমরা অদ্ভুত।

আমরা অদ্ভুত বই কি, কোনো ভুল নেই।

কোটাল। কিন্তু তোমরা ছেলেমান্‌ষি করচ।

ঐরে, আবার ধরা পড়েচি। দাদাও ঠিক ঐ কথাই বলে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা ছেলেমান্‌ষিই করচি।

ওতে আমরা একেবারে পাকা হ'য়ে গেছি।

চন্দ্রহাস। আমাদের এক সর্দ্দার আছে সে ছেলে-মান্‌ষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হুহু করে' চলেছে যে তা'র বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে' পড়ে' গেছে, হুঁস নেই।

কোটাল। আর তোমরা ?

আমরা সব বয়েসের গুটি-কাটা প্রজাপতি।

কোটাল। (জনান্তিকে মাঝির প্রতি) পাগল রে, একেবারে উন্মাদ পাগল!

মাঝি। বাপু, এখন তোমরা কি করবে ?

চন্দ্রহাস। আমরা যাব।

কোটাল। কোথায় ?

চন্দ্রহাস। সেটা আমরা ঠিক করিনি।

কোটাল। যাওয়াটাই ঠিক করেছ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক করনি?

চন্দ্রহাস। সেটা চল্‌তে চল্‌তে আপনি ঠিক হ'য়ে যাবে।

কোটাল। তা'র মানে কি হ'ল?

তা'র মানে হচ্চে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে'।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

কোটাল। তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হ'লে গান গাও?

হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরয় না। শাদা কথায় বল্‌তে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।

কোটাল। তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের গানগুলো খুব পষ্ট।

চন্দ্রহাস। হাঁ, ওতে সুর আছে কি না।

গান

পথিক ভুবন ভালবাসে
পথিক জনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

কোটাল। কোনো সহজ মানুষকে ত কথা বল্‌তে বল্‌তে গান গাইতে শুনি নি।

আবার ধরা পড়ে' গেছিরে, আমরা সহজ মানুষ না।

কোটাল। তোমাদের কোনো কাজকর্ম্ম নেই বুঝি?

না। আমাদের ছুটি।

কোটাল। কেন বল ত?

চন্দ্রহাস। পাছে সময় নষ্ট হয়।

কোটাল। এটা ত বোঝা গেল না।

ঐ দেখ—তা হ'লে আবার গান ধরতে হ'ল।

কোটাল। না তা'র দরকার নেই। আর বেশি বোঝবার আশা রাখিনে।

সবাই আমাদের বোঝবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কোটাল। এমন হ'লে তোমাদের চল্‌বে কি করে' ?

চন্দ্রহাস। আর ত কিছুই চল্‌বার দরকার নেই—শুধু আমরাই চলি।

কোটাল। (মাঝির প্রতি) পাগল রে! উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। এই যে এতক্ষণ পরে দাদা আস্‌চে।

কি দাদা, পিছিয়ে পড়েছিলে কেন ?

চন্দ্রহাস। ওরে আমরা চলি উনপঞ্চাশ বায়ুর মত, আমাদের ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই; আর দাদা চলে শ্রাবণের মেঘ—মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে ভারমোচন করতে হয়। পথের মধ্যে ওকে শ্লোকরচনায় পেয়েছিল।

দাদা। চন্দ্রহাস, দৈবাৎ তোমার মুখে এই উপমাটি উপাদেয় হয়েছে। ওর মধ্যে একটু সার কথা আছে। আমি ওটি চৌপদীতে গেঁথে নিচ্চি।

চন্দ্রহাস। না, না, এখন থাক্ দাদা! আমরা কাজে বেরিয়েছি। তোমার চৌপদীর চার পা, কিন্তু

চল্‌বার বেলা এত বড় খোঁড়া জন্তু জগতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

দাদা। আপনি কে?

আমি ঘাটের মাঝি।

দাদা। আর আপনি?

আমি পাড়ার কোটাল।

দাদা। তা উত্তম হ'ল—আপনাদের কিছু শোনাতে ইচ্ছা করি। বাজে জিনিস না—কাজের কথা।

মাঝি। বেশ, বেশ। আহা, বলেন, বলেন!

কোটাল। আমাদের গুরু বলেছিলেন, ভালো কথা বল্‌বার লোক অনেক মেলে কিন্তু ভালো কথা যে মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শুন্‌তে পারে তা'কেই সাবাস্! ওটা ভাগ্যের কথা কি না। তা বল ঠাকুর বল!

দাদা। আজ পথে যেতে যেতে দেখলুম রাজপুরুষ একজন বন্দীকে নিয়ে চলেচে! শুন্‌লুম, সে কোনো শ্রেষ্ঠী, তা'র টাকার লোভেই রাজা মিথ্যা ছুতো করে' তা'কে ধরেচে। শুনে আমি নিকটেই মুদির দোকানে বসে' এই শ্লোকটি রচনা করেচি। দেখ বাপু, আমি বানিয়ে একটি

কথাও লিখিনে। আমি যা লিখ্‌ব রাস্তায় ঘাটে তা মিলিয়ে নিতে পারবে।

ঠাকুর, কি লিখেচ শুনি।

দাদা।

আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে'
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে।
ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।

বুঝেচ? রস জমায় বলেই ইক্ষু বেটা মরে, যে গাছ ফল দেয় তা'কে ত কেউ মারে না!

কোটাল। ওহে মাঝি, খাসা লিখেচে হে!

মাঝি। ভাই কোটাল, কথাটির মধ্যে সার আছে।

কোটাল। শুন্‌লে মানুষের চৈতন্য হয়। আমাদের কায়েতের পো এখানে থাক্‌লে ওটা লিখে নিতুম রে। পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে!

সর্ব্বনাশ করলে রে!

চন্দ্রহাস। ও ভাই মাঝি, তুমি যে বল্লে আমাদের সঙ্গে বেরবে, দাদার চৌপদী জম্‌লে ত আর—

মাঝি। আরে রস্থন মশায়, পাগ্‌লামি রেখে দিন্‌!

ঠাকুরকে পেয়েছি দুটো ভালো কথা শুনে নিই
—বয়েস হ'য়ে এল, কোন্ দিন মরব।

ভাই, সেই জন্যেই ত বল্‌চি, আমাদের সঙ্গ পেয়েচ,
ছেড়ো না।

চন্দ্রহাস। দাদাকে চিরদিনই পাবে কিন্তু আমরা
একবার ম'লে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন
ভুল করবেন না।

(বাহির হইতে) ওগো, কোটাল, কোটাল, কোটাল!

কেরে। অনাথ [illegible] দেখ্‌ছি। কি হয়েছে?

সেই যে ছেলেটাকে পুষেছিলুম তা'কে বুঝি কাল
রাত্রে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সেই ছেলেধরা।

কোন্ ছেলেধরা?

সেই বুড়ো।

চন্দ্রহাস। বুড়ো? বলিস্ কিরে?

আপনারা অত খুসি হন কেন?

ওটা আমাদের একটা বিশ্রী স্বভাব। আমরা
খামকা খুসি হ'য়ে উঠি!

কোটাল। পাগল! একেবারে উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। তা'কে তুমি দেখেচ হে?

কলু। বোধ হয় কাল রাত্রে তা'কেই দূর থেকে দেখে-
ছিলুম।

কি রকম চেহারাটা ?

কলু। কালো, আমাদের এই কোটাল দাদার চেয়েও।
একেবারে রাত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আর
বুকে দুটো চক্ষু জোনাক পোকার মত জ্বল্‌চে।

ওহে বসন্ত উৎসবে ত মানাবে না।

চন্দ্রহাস। ভাবনা কি ? তেমন যদি দেখি তবে এবার
না হয় পূর্ণিমায় উৎসব না করে' অমাবস্যায় করা
যাবে।

অমাবস্যার বুকে ত চোখের অভাব নেই।

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা ভালো কাজ করচ না।

না, আমরা ভালো কাজ করচিনে।

আবার ধরা পড়েচিরে, আমরা ভালো কাজ
করচিনে। কি করব অভ্যাস নেই।

যেহেতু আমরা ভালমানুষ নই।

কোটাল। একি ঠাট্টা পেয়েচ ? এতে বিপদ আছে।

বিপদ ? সেইটেই ত ঠাট্টা।

গান

ভালমানুষ নইরে মোরা
ভালমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথা কই॥

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা যে কোন্ সর্দ্দারের কথা বল্‌ছিলে সে গেল কোথায়? সে সঙ্গে থাক্‌লে যে তোমাদের সাম্‌লাতে পারত।

সে সঙ্গে থাকে না পাছে সাম্‌লাতে হয়।

সে আমাদের পথে বের করে' দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ায়।

কোটাল। এ তা'র কেমনতর সর্দ্দারি?

চন্দ্রহাস। সর্দ্দারি করে না বলেই তা'কে সর্দ্দার করেচি।

কোটাল। দিব্যি সহজ কাজটি ত সে পেয়েচে।

চন্দ্রহাস। না ভাই, সর্দ্দারি করা সহজ, সর্দ্দার হওয়া সহজ নয়।

গান

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখিনে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বই ॥

দাদা, চল তবে, বেরিয়ে পড়ি।

কোটাল। না, না ঠাকুর, ওদের সঙ্গে কোথায় মরতে যাবে?

মাঝি। তুমি আমাদের শোলোক শোনাও, পাড়ার মানুষ সব এল বলে'! এ সব কথা শোনা ভালো!

দাদা। না ভাই, এখান থেকে আমি নড়চিনে।

তাহ'লে আমরা নড়ি। পাড়ার মানুষ আমাদের সইতে পারে না।

পাড়াকে আমরা নাড়া দিই পাড়া আমাদের তাড়া

দেয়। ঐ যে চৌপদীর গন্ধ পেয়েছে মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যাচ্চে।

পাড়ার লোক। ওরে মাঝির এখানে পাঠ হবে।

কে গো ? তোমরাই পাঠ করবে নাকি ?

আমরা অন্য অনেক অসহ্য উৎপাত করি কিন্তু পাঠ করিনে।

ঐ পুণ্যের জোরেই আমরা রক্ষা পাব।

এরা বলে কিরে ? হেঁয়ালি না কি ?

চন্দ্রহাস। আমরা যা নিজে বুঝি তাই বলি ; হঠাৎ হেঁয়ালি বলে' ভ্রম হয়। আর তোমরা যা খুবই বোঝ দাদা তাই তোমাদের বুঝিয়ে বল্‌বে, হঠাৎ গভীর জ্ঞানের কথা বলে' মনে হবে।

(একজন বালকের প্রবেশ)

আমি পারলুম না। কিছুতে তা'কে ধরতে পারলুম না।

কা'কে ভাই ?

ঐ তোমরা যে বুড়োর খোঁজ করেছিলে তা'কে।

তা'কে দেখেচ না কি ?

সে বোধ হয় রথে চড়ে' গেল।

কোন্ দিকে ?

কিছুই ঠাউরাতে পারলুম না। কিন্তু তা'র চাকার ঘূর্ণিহাওয়ায় এখনো ধূলা উড়চে।

চল্ তবে চল্।

শুক্‌নো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে।

(প্রস্থান

কোটাল। পাগল! উন্মাদ পাগল!

তৃতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের পরাভব

১

বসন্তের হাসির গান

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে!
মরণ আয়োজনের মাঝে
বসে' আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী! হায় হায় রে!

এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক্ না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী! হায় হায় রে!

এবার ওকে মজিয়ে দেরে
হিসাব ভুলের বিষম ফেরে।
কেড়েনে ওর থলি থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগ্‌লাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে!

২

আসন্ন মিলনের গান

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সাম্‌নে সবার পড়্‌ল ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগ্‌লা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি!

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
শুন্‌চ না কি জলে স্থলে
যাদুকরের বাজ্‌ল ভেরী।
দেখ্‌চ না কি এই আলোকে
খেলচে হাসি রবির চোখে,
শাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি॥

তৃতীয় দৃশ্য

মাঠ

সবাই বলে ঐ, ঐ, ঐ,—তা'র পরে চেয়ে দেখলেই
দেখা যায় শুধু ধুলো আর শুকনো পাতা।

তা'র রথের ধ্বজাটা মেঘের মধ্যে যেন একবার
দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু দিক্ ভুল হ'য়ে যায়। এই ভাবি পূবে, এই
ভাবি পশ্চিমে।

এমনি করে' সমস্ত দিন ধুলো আর ছায়ার পিছনে
ঘুরে ঘুরেই হয়রান হ'য়ে গেলুম।

বেলা যে গেল রে ভাই, বেলা যে গেল।

সত্যি কথা বলি, যতই বেলা যাচ্চে ততই মনে
ভয় ঢুকচে।

মনে হচ্চে ভুল করেছি।

সকাল বেলাকার আলো কানে কানে বল্লে, সাবাস, এগিয়ে চল,—বিকেল বেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারি ঠাট্টা করচে।

ঠকলুম বুঝি রে।

দাদার চৌপদীগুলোর উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা বাড়চে।

ভয় হচ্চে আমরাও চৌপদী লিখ্‌তে বসে' যাব—বড় দেরি নেই!

আর পাড়ার লোক আমাদের ঘিরে বস্‌বে।

আর এমনি তাদের ভয়ানক উপকার হ'তে থাক্‌বে যে, তা'রা এক পা নড়বে না।

আমরা রাত্রি বেলাকার পাথরের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে' থাক্‌ব।

আর তা'রা আমাদের চারদিকে কুয়াশার মত ঘন হ'য়ে জম্‌বে।

ও ভাই, আমাদের সর্দ্দার এসব কথা শুন্‌লে বল্‌বে কি?

ওরে আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্চে সর্দ্দারই আমাদের ঠকিয়েছে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কুঁড়ের সর্দ্দার।

ফিরে চল্ রে। এবার সর্দ্দারের সঙ্গে লড়ব।

বলব, আমরা চলব না—দুই পা কাঁধের উপর মুড়ে বস্‌ব। পা দুটো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরল। হাত দুটোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখ্‌ব।

পিছনের কোনো বালাই নেইরে, যত মুস্কিল এই সামনেটাকে নিয়ে।

শরীরে যতগুলো অঙ্গ আছে তা'র মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সে বলে চিৎ হ'য়ে পড়্, চিৎ হ'য়ে পড়্।

কাঁচা বয়সে বুকটা বুক ফুলিয়ে চলে কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর—পড়তেই হয় চিৎ হ'য়ে।

গোড়াতেই যদি চিৎপাত দিয়ে সুরু করা যেত তাহ'লে মাঝখানে উৎপাত থাক্‌ত না রে।

আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরা নদী ব'য়ে চলেছে তা'র কথা মনে পড়চে ভাই।

সেদিন মনে হয়েছিল, সে বল্‌চে, চল্, চল্, চল্,—আজ মনে হচ্চে ভুল শুনেছিলুম, সে বল্‌চে, ছল, ছল, ছল! সংসারটা সবই ছল রে!

সে কথা আমাদের পণ্ডিত গোড়াতেই বলেছিল।

এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপে।

পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়?

কি ভুলটাই করেছিলুম! ভেবেছিলুম চলাটাই বাহাদুরি! কিন্তু না চলাই যে গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়া সমস্তর উল্টো। সেটাই ত তেজের কথা হ'ল।

ওরে বীর, কোমর বাঁধ্ রে—আমরা চল্‌ব না।

ওরে পালোয়ান, তাল ঠুকে বসে' পড়্, আমরা চল্‌ব না।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং—আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই; আমরা চল্‌ব না।

চলজ্জীবন যৌবনং—আমাদের জীবনও থাক্ যৌবনও থাক্, আমরা চল্‌ব না।

যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছি ফিরে চল্।

না রে সেখানে ফিরতে হ'লেও চল্‌তে হবে।

তবে?

তবে আর কি? যেখানে এসে পড়েছি এইখানেই বসে' পড়ি।

মনে করি এইখানেই বরাবর বসে' আছি।

জন্মাবার ঢের আগে থেকে।

মরার ঢের পরে পর্য্যন্ত।

ঠিক বলেছিস্, তাহ'লে মনটা স্থির থাক্‌বে। আর-কোথাও থেকে এসেছি জান্‌লেই আর-কোথাও যাবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করে।

আর-কোথাওটা বড় সর্ব্বনেশে দেশ রে!

সেখানে দেশটা সুদ্ধ চলে। তা'র পথগুলো চলে।

কিন্তু আমরা—

গান

মোরা চল্‌ব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফল্‌ব না!

সূর্য্য তারা আগুন ভুগে
জ্বলে' মরুক্ যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই না জ্বালা
জ্বল্‌ব না!

বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
বল্‌ব না!

কোথা হ'তে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা ত এই প্রাণের টলায়
টল্‌ব না ॥

ওরে হাসিরে হাসি!
ঐ হাসি শোনা যাচ্চে।
বাঁচা গেল এতক্ষণে একটা হাসি শোনা গেল!
যেন গুমটের ঘোমটা খুলে গেল।
এ যেন বৈশাখের এক পস্‌লা বৃষ্টি!
কার হাসি ভাই?
শুনেই বুঝ্‌তে পারচিস্‌নে, আমাদের চন্দ্রহাসের হাসি।
কি আশ্চর্য্য হাসি ওর?
যেন ঝরনার মত, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।
যেন সূর্য্যের আলো, কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে' কাটে।
যাক্ আমাদের চৌপদীর ফাঁড়া কাট্‌ল! এবার উঠে পড়।

এবার কাজ ছাড়া কথা নেই—চরাচরমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

ও আবার কি রকম কথা হ'ল? ঈশানকে এখনো চৌপদীর ভূত ছাড়েনি!

কীর্ত্তি? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে? কীর্ত্তি ত আমাদের ফেনা—ছড়াতে ছড়াতে চলে' যাব। ফিরে তাকাব না।

এস ভাই চন্দ্রহাস, এস, তোমার হাসিমুখ যে!

চন্দ্রহাস। বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েছি।

কা'র কাছ থেকে?

চন্দ্রহাস। এই বাউলের কাছ থেকে।

ওকি? ও যে অন্ধ।

চন্দ্রহাস। সেইজন্যে ওকে রাস্তা খুঁজ্‌তে হয় না, ভিতর থেকে দেখ্‌তে পায়।

কি হে ভাই, ঠিক নিয়ে যেতে পারবে ত?

বাউল। ঠিক নিয়ে যাব।

কেমন করে'?

বাউল। আমি যে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাই।

কান ত আমাদেরও আছে, কিন্তু—

বাউল। আমি যে সব-দিয়ে শুনি—শুধু কান-দিয়ে না।

চন্দ্রহাস। রাস্তায় যাকে জিজ্ঞাসা করি বুড়োর কথা শুন্‌লেই আঁৎকে ওঠে, কেবল দেখি এরই ভয় নেই।

ও বোধ হয় চোখে দেখ্‌তে পায় না বলেই ভয় করে না।

বাউল। না গো, আমি কেন ভয় করিনে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হ'ল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হ'ল। সূর্য্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।

তাহ'লে এখন চল। ঐ ত সন্ধ্যাতারা উঠেছে।

বাউল। আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস! গান না গাইলে আমি রাস্তা পাইনে!

সে কি কথা হে?

বাউল। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়—সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।

গান

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
চল তোমার বিজন মন্দিরে।
জানিনে পথ, নাই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো;
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে।

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে।
চল অন্ধকারের তীরে তীরে।
চল্‌ব আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইসারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি
আজ এই বসন্ত সমীরে

চতুর্থ দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

নবীনের জয়

১

প্রত্যাগত যৌবনের গান

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই ত আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কেগো তুমি?—আমি বকুল;
কেগো তুমি?—আমি পারুল;
তোমরা কে বা?—আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।

এবার যখন ঝরব মোরা
ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে!
অফুরানের আঁচল ভরে'
মরব মোরা প্রাণের সুখে।

তুমি কে গো ?—আমি শিমুল ;
তুমি কে গো ?—কামিনী ফুল ;
তোমরা কে বা—আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে ॥

নূতন আশার গান

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিল্‌ব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ।
অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,
বুকের মাতন টুট্‌বে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ।

বাঁশিতে গান উঠ্‌বে পূরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশবীণার সোনার সুরে ।

আমার মনের সকল কোণে
ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারি নীর
উঠ্‌বে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥

৩

বোঝাপড়ার গান

এবার ত যৌবনের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ ?
জেনেছি।
আবরণকে বরণ করে'
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে !
আপনাকে আজ বাহির করে' এনেছ ?
এনেছি।

এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি।
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছ ?
জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধূলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছ ?
হেনেছি॥

নবীন রূপের গান

এতদিন যে বসেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুণে',
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়-
এ কি গো বিস্ময় !
অবাক্ আমি তরুণ গলার
গান শুনে।

গন্ধে উদাস হাওয়ার মত
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্
আগুন ঢাকা রয়—
এ কি গো বিস্ময়!
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ
কোন্ তূণে!

চতুর্থ দৃশ্য

গুহা-দ্বার

দেখ দেখি ভাই, আবার আমাদের ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেল!

ওকে কি ধরে' রাখ্‌বার জো আছে?

বসে' বিশ্রাম করি আমরা, ও চলে' বিশ্রাম করে।

অন্ধ বাউলকে নিয়ে সে নদীর ওপারে চলে' গেছে।

আর কিছু নয়, ঐ অন্ধের অন্ধতার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তবে ছাড়বে।

তাই আমাদের সর্দ্দার ওকে ডুবুরি বলে।

চন্দ্রহাস একটু সরে' গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না।

ও কাছে থাক্‌লে মনে হয় কিছু হোক্ বা না হোক্ তবু মজা আছে। এমন কি বিপদের আশঙ্কা থাক্‌লে মনে হয় সে আরো বেশি মজা।

আজ এই রাত্রে ওর জন্যে মনটা কেমন করচে।

দেখচিস্ এখানকার হাওয়াটা কেমনতর ?

এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

যারা সেখানে বল্‌ছিল চল্ চল্, তা'রা এখানে বল্‌চে যাই যাই।

কথাটা একই, সুরটা আলাদা।

মনটার ভিতরে কেমন ব্যথা দিচ্চে, তবু লাগ্‌চে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে' আস্‌চে এ যেন কোন্ দুপুররাতের চোখের জল।

পৃথিবীর দিকে এমন করে' কখনো আমরা দেখিনি।

ঊর্দ্ধশ্বাসে যখন সাম্‌নে ছুটি তখন সাম্‌নের দিকেই চোখ থাকে, চারপাশের দিকে নয়।

বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনি সকলের দিকে চোখ মেলি।

আর দেখি বড় মধুর। যদি সবাই চলে' চলে' না যেত তাহ'লে কি কোনো মাধুরী চোখে পড়্‌ত ?

চলার মধ্যে যদি কেবলি তেজ থাক্‌ত তাহ'লে

যৌবন শুকিয়ে যেত। তা'র মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

(এই জায়গাটাতে এসে শুন্‌তে পাচ্চি জগৎটা কেবল "পাব" "পাব" বল্‌চে না—সঙ্গে সঙ্গেই বল্‌চে, ছাড়ব, ছাড়ব।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে "পাব"র সঙ্গে "ছাড়ব"র বিয়ে হ'য়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।)

অন্ধ বাউল আমাদের এ কোন্ দেশে আন্‌লে ভাই?

ঐ তারাগুলোর দিকে তাকাচ্চি আর মনে হচ্চে যুগে যুগে যাদের ফেলে এসেছি তাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত রাত একেবারে ছেয়ে রয়েচে।

ফুলগুলোর মধ্যে কা'ন্না বল্‌চে মনে রেখো, মনে রেখো, তাদের নাম ত মনে নেই কিন্তু মন যে উদাস হ'য়ে ওঠে।

একটা গান না গাইলে বুক ফেটে যাবে।

গান

তুই ফেলে এসেছিস্ কারে? (মন, মন রে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলিনারে! (মন, মন রে আমার)

যে পথ দিয়ে চলে' এলি
সে পথ এখন ভুলে গেলি,
কেমন করে' ফিরবি তাহার দ্বারে ? (মন, মন রে আমার)
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্ম্মরেতে।
মনে হয় রে পাব খুঁজি
ফুলের ভাষা যদি বুঝি,
যে পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে। (মন, মন রে আমার)

এবার আমাদের বসন্ত উৎসবে এ কি রকম সুর লাগ্‌চে ?

এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তা'র চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে ছিল।

ভেবেছিল আমরা বুঝ্‌তে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল !

কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে !

প্রিয়া এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্চে আমাদের যা আছে সমস্তই—

আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—
চাচ্চে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ থেকেও লুকিয়ে আছে।
ওযে কিছু পায় কিছু পায় না, এই জন্যেই ওর কান্না। পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায়।
ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেব না!

গান

আমি যাব না গো অম্‌নি চলে'।
মালা তোমার দেব গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুন শেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাব বলে'।
কিছু হ'ল, অনেক বাকি;
ক্ষমা আমায় করবে না কি?
গান এসেচে সুর আসে নাই
হ'ল না যে শোনানো তাই,
সে সুর আমার রইল ঢাকা
নয়নজলে নয়নজলে॥

ও ভাই, কে যেন গেল বোধ হচ্চে।

আরে, গেল, গেল, গেল, এ ছাড়া আর ত কিছুই বোধ হচ্চে না।

আমার গায়ের উপর কোন্ পথিকের কাপড় ঠেকে গেল!

নিয়ে চল পথিক, নিয়ে চল তোমার সঙ্গে, হাওয়া যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে যায়।

কা'কে ধরে' আন্‌বার জন্যে বেরিয়েছিলুম কিন্তু ধরা দেবার জন্যেই মন আকুল হ'ল।

(বাউলের প্রবেশ)

এই যে আমাদের বাউল। আমাদের এ কোথায় এনেচ, এখানে সমস্ত পথিকজগতের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগ্‌চে—সমস্ত তারাগুলোর!

আমরা খেলাচ্ছলে বেরিয়েছিলুম কিন্তু খেলাটা যে কি তা ভুলেই গেছি।

আমরা তা'কেই ধরতে বেরিয়েছিলুম পৃথিবীর মধ্যে যে বুড়ো।

রাস্তায় সবাই বল্লে সে ভয়ঙ্কর। সে কেবলমাত্র একটা মুণ্ডু, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যেই তা'র একমাত্র লোভ।

কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। মনের ভিতর বল্‌চে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে' থাক্‌ব না। ফুল যাচ্চে, পাতা যাচ্চে, নদীর জল যাচ্চে— তা'র পিছন পিছন আমিও যাব।

ও ভাই বাউল, তোমার একতারাতে একটা সুর লাগাও! রাত কত হ'ল কে জানে? হয় ত বা ভোর হ'য়ে এল।

বাউলের গান

সবাই যারে সব দিতেছে
তা'র কাছে সব দিয়ে ফেলি।
ক'বার আগে চা'বার আগে
আপনি আমায় দেব মেলি।
নেবার বেলা হলেম ঋণী,
ভিড় করেছি, ভয় করিনি,
এখনো ভয় করব নারে,
দেবার খেলা এবার খেলি।
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে।
সন্ধ্যা তা'রে প্রণাম করে
সব সোনা তা'র দেয়রে শুধে।

ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে,
আপ্‌নাকে ভাই ফুরিয়ে-দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি॥

ওহে বাউল, চন্দ্রহাস এখনো এল না কেন?

বাউল। সে যে গেছে, তা জান না?

গেছে? কোথায় গেছে?

বাউল। সে বল্লে, আমি তা'কে জয় করে' আন্‌ব।

কা'কে?

বাউল। যাকে সবাই ভয় করে। সে বল্লে, নইলে আমার কিসের যৌবন!

বাঃ এ ত বেশ কথা! দাদা গেল পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেল ঠিকানাই নেই!

বাউল। সে বল্লে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ!

তারি ঢেউ?

বাউল। হাঁ। খবর এসেচে মানুষের লড়াই শেষ হয় নি। বসন্তের এই কি খবর?

বাউল। যারা মরে' অমর, বসন্তের কচি পাতায় তা'রাই

পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তা'রা রটাচ্চে—"আমরা পথের বিচার করিনি—আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি—আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাব্‌তে বস্‌তুম তাহ'লে বসন্তের দশা কি হ'ত?"

চন্দ্রহাস তাই বুঝি ক্ষেপে উঠেচে?

বাউল। সে বল্লে—

গান

বসন্তে ফুল গাঁথ্‌ল আমার
জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা!
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছেরে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আন্‌ল আমার
বরণ ডালা।
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তা'র
আমায় মাতালে।

কুড়িয়ে নেবার ঘুচ্‌ল পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগ্‌ল নেশা,
আরাম বলে, "এল আমার
যাবার পালা!"

কিন্তু সে গেল কোথায়?

বাউল। সে বল্লে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে' বসে' থাক্‌তে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে' আন্‌ব।

কিন্তু গেল কোন্ দিকে?

বাউল। সেই গুহার মধ্যে চলে' গেছে।

সে কি কথা? সে যে ঘোর অন্ধকার!

কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—

বাউল। সে নিজেই খবর নিতে গেছে।

ফিরবে কখন?

তুইও যেমন? সে কি আর ফিরবে?

কিন্তু চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনের রইল কি?

আমাদের সর্দ্দারের কাছে কি জবাব দেব?

এবার সর্দ্দারও আমাদের ছাড়বে।

যাবার সময় আমাদের কি বলে' গেল সে?

বাউল। বল্লে' আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আস্‌ব।

ফিরে আস্‌বে? কেমন করে' জান্‌ব?

বাউল। সে ত বল্লে, আমি জয়ী হ'য়ে ফিরে আস্‌ব।

তাহ'লে আমরা সমস্ত রাত অপেক্ষা করে' থাক্‌ব।

বাউল, কোথায় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?

বাউল। এই যে গুহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আস্‌চে এরি মুখের কাছে।

ঐ গুহায় কোন্ রাস্তা দিয়ে গেল? ওখানে যে কালো খাঁড়ার মত অন্ধকার!

বাউল। রাত্রের পাখীগুলোর ডানার শব্দ ধরে' গেছে।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন?

বাউল। আমাকে তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে রেখে গেল।

কখন্ গেছে বল ত?

বাউল। অনেকক্ষণ—রাতের প্রথম প্রহরেই।

এখন বোধ হয় তিন প্রহর পেরিয়ে গেছে। কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে—গা সির্ সির্ করচে।

দেখ ভাই, স্বপ্ন দেখেছি যেন তিন জন মেয়ে মানুষ চুল এলিয়ে দিয়ে—

তোর স্বপ্নের কথা রেখে দে! ভালো লাগ্‌চে না!

সব লক্ষণগুলো কেমন খারাপ ঠেক্‌চে।

প্যাঁচাটা ডাক্‌ছিল, এতক্ষণ কিছু মনে হয়নি—কিন্তু —মাঠের ওপারে কুকুরটা কি রকম বিশ্রী সুরে চ্যাঁচাচ্ছে শুন্‌চিস্!

ঠিক যেন তা'র পিঠের উপর ডাইনি সওয়ার হ'য়ে তা'কে চাব্‌কাচ্ছে।

যদি ফেরবার হ'ত চন্দ্রহাস এতক্ষণে ফিরত।

রাতটা কেটে গেলে বাঁচা যায়!

শোন্ রে ভাই মেয়েমানুষের কান্না!

ওরা ত কাঁদ্‌চেই—কেবল কাঁদ্‌চেই, অথচ কাউকে ধরে' রাখ্‌তে পারচে না।

নাঃ আর পারা যায় না—চুপ করে' বসে' থাক্‌লেই যত কুলক্ষণ দেখা যায়।

চল আমরাও যাই—পথ চল্লেই ভয় থাকে না!

পথ দেখাবে কে?

ঐ যে বাউল আছে।

কি হে, তুমি পথ দেখাতে পার ?

বাউল। পারি।

বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। তুমি চোখে না দেখে পথ বের কর শুধু গান গেয়ে ?

তুমি চন্দ্রহাসকে কী রাস্তা দেখিয়ে দিলে ! যদি সে ফিরে আসে তবে তোমাকে বিশ্বাস করব।

ফিরে যদি না আসে তাহ'লে কিন্তু—

চন্দ্রহাসকে যে আমরা এত ভালবাস্‌তুম তা জান্‌তুম না।

এতদিন ওকে নিয়ে আমরা যা খুসি তাই করেচি।

যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়, যার সঙ্গে খেলি তা'কে নজর করিনে।

এবার যদি সে ফেরে, তা'কে মুহূর্ত্তের জন্যে অনাদর করব না।

আমার মনে হচ্চে আমরা কেবলি তা'কে দুঃখ দিয়েচি।

তা'র ভালবাসা সব দুঃখকে ছাড়িয়ে উঠেছিল্।

সে যে কি সুন্দর ছিল যখন তা'কে চোখে দেখ্‌লুম তখন সেটা চোখে পড়েনি।

গান

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখ্‌ব, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্‌ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক্‌ না এখন প্রাণের মেলা,—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে।

ঐ বাউলটা চুপ করে' বসে' থাকে, কথা কয় না,
ভালো লাগ্‌চে না।
ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ!
যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।

দাও ভাই দাও, ওকে বিদায় করে' দাও !

না, না, ও বসে' আছে তবু একটা ভরসা আছে।

দেখ্‌চ না ওর মুখে কিচ্ছু ভয় নেই !

মনে হচ্চে ওর কপালে যেন কি সব খবর আস্‌চে।

ওর সমস্ত গা যেন অনেক দূরের কা'কে দেখ্‌তে পাচ্চে। ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।

ওকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারি কে আস্‌চে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে'।

ঐ দেখ জোড়হাত করে' উঠে দাঁড়িয়েছে।

পূবের দিকে মুখ করে' কা'কে প্রণাম করচে।

ওখানে ত কিচ্ছুই নেই—একটু আলোর রেখাও না।

একবার জিজ্ঞাসাই কর না, ও কি দেখ্‌চে—কা'কে দেখ্‌চে ! না, না, এখন ওরে কিছু বোলো না।

আমার কি মনে হচ্চে জান ? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।

যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া নৌকোটির মত এসে ঠেকেচে !

ওর মনটা ভোর বেলাকার আকাশের মত চুপ।

এখনি যেন পাখীর গানের ঝড় উঠ্‌বে—তা'র
আগে সমস্ত থম্‌থমে।
ঐ একটু একটু একতারাতে ঝঙ্কার দিচ্চে, ওর মন
গান গাচ্চে।
চুপ কর চুপ কর ঐ গান ধরেছে।

বাউলের গান

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্‌,
আশার অরুণালোক
হোক্‌ অভ্যুদয় রে॥

ঐ যে!
চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস!

রোস্ রোস্ ব্যস্ত হোস্‌নে—এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্চে না! না, ও চন্দ্রহাস ছাড়া আর কেউ হ'তে পারে না।

বাঁচলুম, বাঁচলুম।

এস, এস চন্দ্রহাস!

এতক্ষণ আমাদের ছেড়ে কি করলে ভাই বল।

যাকে ধরতে গিয়েছিলে তা'কে ধরতে পেরেচ?

চন্দ্রহাস। ধরেচি তা'কে ধরেচি।

কই তা'কে ত দেখ্‌চি নে।

চন্দ্রহাস। সে আস্‌চে—এখনি আস্‌চে।

কি তুমি দেখ্‌লে আমাকে বল ভাই।

চন্দ্রহাস। সে ত আমি বল্‌তে পারব না।

কেন?

চন্দ্রহাস। সে ত আমি চোখ-দিয়ে দেখিনি।

তবে?

চন্দ্রহাস। আমার সব-দিয়ে দেখেছিলুম।

তা হোক্ না, বল না ভাই।

চন্দ্রহাস। আমার সমস্ত দেহ মন যদি কণ্ঠ হ'ত বল্‌তে পারত।

কা'কে তুমি ধরেচ তাও কি বুঝ্‌তে পারলে না?

জগতের সেই বিরাট বুড়োটাকে ?

যে বুড়োটা অগস্ত্যের মত পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র
শুষে খেতে যায় ?

সেই যে ভয়ঙ্কর ? যে অন্ধকারের মত ? যার
বুকে চোখ ?

যার পা উল্টো দিকে ? যে পিছনে হেঁটে চলে ?

নরমুণ্ড যার গলায় ? শ্মশানে যার বাস ?

চন্দ্রহাস। আমি ত বল্‌তে পারিনে। সে আস্‌চে
এখনি তা'কে দেখ্‌তে পাব।

ভাই বাউল, তুমি দেখেচ তা'কে ?

বাউল। হাঁ, এই ত দেখ্‌চি।

কই ?

বাউল। এই যে !

ঐ যে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এল।

ঐ যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এল !

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

চন্দ্রহাস। এ কি, এ যে তুমি !

তুমি ! সেই আমাদের সর্দ্দার !

আমাদের সর্দ্দার রে !

বুড়ো কোথায় ?

সর্দ্দার। কোথাও ত নেই।

কোথাও না?

সর্দ্দার। না।

তবে সে কি?

সর্দ্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখ্‌লে তা'রা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তা'র ঠিক নেই।

সেই ধূলোর ভিতর থেকে আমরা ত তোমাকে চিন্‌তে পারিনি।

তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে' মনে হ'ল।

তা'র পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্চে যেন তুমি বালক।

যেন তোমাকে এই প্রথম দেখ্‌লুম!

চন্দ্রহাস। এ ত বড় আশ্চর্য্য! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!

ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হ'ল। বুড়োকে ধরতে পারলে না।

চন্দ্রহাস। আর দেরি না—এবার উৎসব সুরু হোক। সূর্য্য উঠেচে।

ভাই বাউল, তুমি যদি অমন চুপ করে' থাক তাহ'লে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে। একটা গান ধর।

বাউলের গান

তোমায় নতুন করেই পাব বলে'
হারাই ক্ষণে ক্ষণ—
ও মোর ভালবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে' তুমি
হও যে অদর্শন
ও মোর ভালবাসার ধন।
ও গো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন,
ও মোর ভালবাসার ধন।
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন—
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ করে' দাও আপনাকে যে,
ঐ হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন—
ও মোর ভালবাসার ধন ॥

ঐ যে গুন্ গুন্ শব্দ শোনা যাচ্চে।

শুন্‌চি বটে।

ও ত মধুকরের দল নয়, পাড়ার লোক।

তাহ'লে দাদা আস্‌চে চৌপদী নিয়ে।

দাদা। সর্দ্দার না কি?

সর্দ্দার। কি দাদা?

দাদা। ভালোই হয়েছে। চৌপদীগুলো শুনিয়ে দিই।

না, না, গুলো নয়, গুলো নয়! একটা।

দাদা। আচ্ছা ভাই, ভয় নেই, একটাই হবে।

সূর্য্য এল পূর্ব্বদ্বারে তূর্য্য বাজে তা'র।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার,
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার ॥

অর্থাৎ—

আবার অর্থাৎ!

না, এখানে অর্থাৎ চল্‌বে না।

দাদা। এর মানে—

না, মানে না। মানে বুঝ্‌ব না এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

দাদা। এমন মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

আজ আমাদের উৎসব।

দাদা। উৎসব না কি? তাহ'লে আমি পাড়ায়—

চন্দ্রহাস। না, তোমাকে পাড়ায় যেতে দিচ্চিনে।

দাদা। আমাকে দরকার আছে না কি?

আছে।

দাদা। আমার চৌপদী—

চন্দ্রহাস। তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তা'র অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে।

সুতরাং অর্থ না থাক্‌লে মানুষের যে দশা হয় তোমার তাই হবে।

অর্থাৎ পাড়ার লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে।

কোটাল তোমাকে বল্‌বে অবোধ।

পণ্ডিত বল্‌বে অর্ব্বাচীন।

ঘরের লোক বল্‌বে অনাবশ্যক।

বাইরের লোক বল্‌বে অদ্ভুত।

চন্দ্রহাস। আমরা তোমার মাথায় পরাব নব পল্লবের মুকুট।

তোমার গলায় পরাব নব মল্লিকার মালা।

পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর বুঝ্‌বে না।

সকলে মিলিয়া

উৎসবের গান

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছনপানের বাঁধন হ'তে
চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

ফাল্গুনী

বাঁধন যত ছিন্ন কর আনন্দে

আজ নবীন প্রাণের বসন্তে !

অকূল প্রাণের সাগর-তীরে

ভয় কিরে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে ?

যা আছে রে সব নিয়ে তোর

ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে

আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥

২০শে ফাল্গুন

১৩২১।